ঐতিহ্য রজতজয়ন্তী গ্রন্থমালা

আমার বিশ্বাস

আবদুল মান্নান সৈয়দ

ঐতিহ্য

আবদুল হাফিজ
অধ্যাপক, প্রাবন্ধিক, গবেষক, লোকসাহিত্যবিশেষজ্ঞ
শ্রদ্ধাস্পদেষু

লেখকের কথা

'আমার বিশ্বাস' নামে আমার শিল্প-সাহিত্য-জৈবনিক দৃষ্টিবাহী একটি লেখা লিখেছিলাম ১৯৮২ সালে। 'দৈনিক ইত্তেফাক'-এর সাহিত্যপৃষ্ঠায় পরপর দুসংখ্যায় বেরিয়েছিল (১৬ এবং ২৩শে আগস্ট ১৯৮২ সালে)। পরে লেখাটির এক সংক্ষিপ্ত রূপ প্রকাশিত হয় কলকাতার 'কাফেলা' (জ্যৈষ্ঠ ১৩৮৯) পত্রিকায়।

এ বছর (১৯৮৩) মোটামুটি কাছাকাছি সময়ের মধ্যে লিখলাম আত্মবিশ্লেষক তিনটি রচনা : 'আমার কবিতা', 'আমার গদ্য,' এবং 'আমার কথকতা'। লেখাগুলি প্রকাশিত হয়েছে নতুন পত্রিকা 'সাহিত্য' এর তিনটি সংখ্যায় (প্রথম, দ্বিতীয় ও চতুর্থ সংখ্যায়)। এই প্রণয়নগুলি সম্ভব হয়েছে কবি বন্ধু আনওয়ার আহমদের আন্তরিক ও বিরামহীন তাগাদায়। এখন গ্রন্থাকারে প্রকাশিতও হচ্ছে তাঁরই সৌজন্যে। আমি কৃতজ্ঞ।

সবমিলিয়ে একটি-কোনো দৃষ্টি এই সমস্ত লেখা থেকে পাঠকের চোখে স্পষ্ট হবে, বিনীত এই আশা রাখি।

৫১ গ্রীন রোড, ঢাকা ৫ — আবদুল মান্নান সৈয়দ

সূচি

আমার গদ্য ১১
আমার কথকতা ২৭
আমার কবিতা ৩৭
আমার বিশ্বাস ৫২

আমার গদ্য

আমি যখন সপ্তম শ্রেণিতে পড়ি, এক ঘটনা ঘটে। পরীক্ষার খাতায় যে ভাষায় লিখেছিলাম তা দেখে আমাদের বাংলার মাস্টারশাহেব আমাকে এমনই তিরস্কার করেন যে আমি কেঁদে ফেলি। ওই একই পরীক্ষায় অন্য একজন মাস্টারশাহেব সারা ক্লাসের সামনে ভবিষ্যদ্বাণীর মতো করে বলেন, এই ছেলে একদিন লেখক হবে।

আমার ওই এগারো-বারো বছর বয়সের ঘটনাটি আমার পরবর্তী সাহিত্যজীবনের একটি প্রতিফলক। আমার গদ্য-রচনার জন্য আমি প্রথমাবধি সমানভাবে ধিক্কৃত ও প্রশংসিত হয়ে আসছি।

কেন ওই বয়সে লিখেছিলাম অস্বাভাবিক ভাষায় (যদ্দূর মনে আছে, দুরূহ শব্দ আকীর্ণ করে)? আজ মনে হয়, বিষয়টি ছিল আমার রক্তের ভেতরেই, কোনো বহিঃপ্ররোচনা ওই বয়সে ছিল বলে মনে হয় না, থাকা সম্ভবও না।

আজ এই আত্মকেন্দ্রী রচনায় সেই ধরনের গদ্যলেখার কথাই আমি বলতে বসেছি, যা গল্প-উপন্যাস নয়— সৃজন মননশীল গদ্যলেখা। এই (তথাকথিত সৃষ্টিশীল নয়, কিন্তু প্রকৃত অর্থে সৃষ্টিশীলই, এবং) চিন্তামূলক গদ্যরচনায় আমি প্রথমাবধি নিযুক্ত ছিলাম— ইস্কুলজীবন থেকেই। আসলে ছোটবেলা থেকেই আমি সবরকম লেখা লিখি— কবিতা, গল্প, নাটক, উপন্যাস; এবং তার সঙ্গে প্রবন্ধধর্মী লেখাও। আর ছোটবেলা থেকেই পাঠক হিশাবে আমি সর্বগ্রাসী। বাংলা ভাষায় লেখা যেকোনো জিনিশই পাঠে আমার অসীম আগ্রহ ও কৌতূহল। আমি পড়িনি বা পড়ি না বাংলা ভাষায় লেখা এমন কোনো বিষয় নেই। (বরং আজকাল আমি পাঠ-ব্যাপারে নির্বাচনের পক্ষপাতী; সময়, প্রয়োজন, চোখের ব্যবহার সম্পর্কে

সচেতন।) আসলে— আজ মনে হয়— আমি বোধ হয় বাংলা বর্ণমালারই পাগল প্রেমিক, সাহিত্যের ভালোবাসার চেয়ে ভাষার ভালোবাসাই বোধ হয় আমার প্রথম।

আমাদের ছেলেবেলায় রেডিও-টেলিভিশনের স্বর্ণযুগ আসেনি; কাজেই বহিঃপৃথিবীকে গ্রহণ করার পথ ছিল সংকীর্ণ কিন্তু মুক্ত। আমার পক্ষে সেই সরু ও খোলা পথটি ছিল বইয়ের। কিন্তু তখনকার দিনে মধ্যবিত্ত বাঙালি-মুসলমান পরিবারে পাঠ্যবস্তু কী-ই বা ছিল : পঞ্জিকা ধর্মগ্রন্থ ধর্মগ্রন্থপ্রতিম কিছু উপন্যাস— এসব আমার যথাসময়ের আগেই পড়া হয়ে গিয়েছিল। পড়ে ফেলেছিলাম অগ্রজ ভাইবোনের বাংলা পাঠ্যবইগুলিও। তখনকার দিনে, ঢাকায় ও মফস্‌সলে, লাইব্রেরি ছিল পাড়ায়-পাড়ায়। আমি লাইব্রেরিতে গিয়ে, বা বাড়িতে এনে বই পড়তাম অবিরলধারে। একবার গরমের ছুটিতে মফস্‌সল শহরে বেড়াতে গিয়ে পেয়ে গিয়েছিলাম অকালমৃত এক শৌখিন দূর-আত্মীয়ের এক সিন্দুক-ভরা বইয়ের সংগ্রহ— সমুদ্রের তলা থেকে কয়েকশ বছর আগে ডুবে-যাওয়া এক হীরে-জহরত-ভরা জাহাজ পেলে ডুবুরির যে আনন্দ হয়, সেইরকম আনন্দ পেয়েছিলাম। আর পড়তাম বন্ধুবান্ধবের কাছে চেয়েচিন্তে। ছোটবেলা থেকে আমি স্বভাবত ছিলাম নির্জন, আত্মকেন্দ্রী, অমিশুক ও চূড়ান্তরকম অসামাজিক। শুধু একজনের সঙ্গে খাতির হয়ে যেত আমার সবচেয়ে অনায়াসে—তিনি লাইব্রেরিয়ান মহোদয়। হেঁটে হেঁটে লাইব্রেরিতে গিয়ে অনেকক্ষণ পড়তাম যতক্ষণ চোখে আঁধার না দেখি। আর লাইব্রেরি যেদিন বন্ধ থাকত সেদিন আমার আনন্দের প্রধান দরজাটি যেত রুদ্ধ হয়ে। ইস্কুলের উঁচু ক্লাসে উঠে আমার প্রিয় পাঠ্য এবং অবসর বিনোদনের উপায় ছিল অভিধান পাঠ। খেলাধুলোর উৎসাহ ছিল অন্যান্য বালক-কিশোরদের মতোই প্রচণ্ড; কিন্তু যত বয়স বাড়ছিল তত খেলাধুলোর প্রতি আকর্ষণ কমে যেতে থাকে আমার। পাঠ এবং ভাবনা— এই দুজন হয়ে ওঠে আমার নিত্যসঙ্গী। গোধূলির আলোয় যতক্ষণ দেখা যেত ততক্ষণ চোখ আটকে থাকত অভিধানের শব্দপুঞ্জে। এইভাবে বাংলা ভাষার সংখ্যাহীন শব্দের সঙ্গে আমার পরিচয়, প্রণয়, এমনকি পরিণয়ও বলা যেতে পারে, ঘটে যায়। বিধিবদ্ধভাবে বাংলা ব্যাকরণ আমি কখনো শিখিনি; কিন্তু ক্রমাগত পড়ে-পড়ে আমার ইন্দ্রিয়ে এক ধরনের বোধ জন্মায়, যার বলে আমি বাক্যের শুদ্ধতা-অশুদ্ধতা ধরে ফেলতে পারতাম। অঙ্কে ছিলাম অসম্ভব কাঁচা এবং

সীমাহীন রূপে অক্ষম। আমি মুগ্ধ ছিলাম বিজ্ঞানের বিস্ময়ে। ফলে, পাঠ নিতে হয় কলা বিষয়েই। ম্যাট্রিক পাশ করবার পর, আম্মার আমার আর্ট কলেজে ভর্তি হওয়ার প্রস্তাব নাকচ করে দেন আব্বা; কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ে আমি যখন বাংলা ভাষা-সাহিত্য পড়বার সিদ্ধান্ত নিই, আব্বার তাতে অনুমোদন ছিল। ফলে প্রিয় বিষয় নিয়েই আমার ছাত্রাবস্থা শেষ হয় এবং তারপর জীবিকা হিশাবে অধ্যাপনা গ্রহণ করাতেও আমি আমার প্রিয় বলয়ের মধ্যেই থেকে গেলাম। অধ্যয়ন, অধ্যাপনা, লেখা, সম্পাদনা, প্রকাশনা : এইসব পরস্পরসম্পৃক্ত বিষয় নিয়ে আমি এই দুঃস্বপ্নিল পৃথিবীতে আমার আপন বিশ্ব রচনা করেছি, এটুকুকেই আমি আমার পরম সৌভাগ্য বলে মনে করি।

পাঠ্য বলতে স্বাভাবিকভাবেই মূলত কবিতা নয়, যদিও কবিতা আমার প্রিয় পাঠ্যের অন্তর্গত। পাঠ্য মূলত গদ্যই। অনেকদিন ধরে সবকিছুই। সম্প্রতি বড় উপন্যাস পড়তেই পারি না প্রায়। অর্থাৎ আমার এখন পর্যন্ত মূল পাঠ্য চিন্তামূলক গদ্যরচনাই। বাংলা ও ইংরেজি ভাষায়। খুব সম্প্রতি লেখক-শিল্পীদের জীবনীও আমাকে আকর্ষণ করছে প্রবলভাবে। জীবনযাপনের ছন্দের সঙ্গে রচনার ছন্দ কী করে মেলে, কী করে জীবনকেই রচনা করে নিতে হয়, কী করে জীবনের হলাহলগুলিকে অগ্রাহ্য করতে হয়— এসবও তা থেকে শিখি। এই সবই আমার গদ্যরচনায় চিন্তা, চিন্তার ভেতরে অনুভূতি ও অভিজ্ঞতার সারাৎসার মেশাতে শেখায়। স্বাভাবিকভাবেই আমার গদ্যরচনার পেছনে কাজ করে আমার গদ্য পাঠ।

কিন্তু ক্রমশ বুদ্ধি দিয়েই বুদ্ধিকে দূরে রাখতে শিখেছি, মননই জানিয়ে দিয়েছে মননের পথে মুক্তি নেই, মুক্তি হৃদয়ের রাস্তায়। আজ তাই বুঝি; পাণ্ডিত্য যদি প্রজ্ঞার দ্বারা পরিশোধিত না হয়, তাহলে শিখর-বিজয় বোধ হয় অসম্পূর্ণই থাকবে। আমি এমন রচনাও লিখতে চাই, যা একেবারেই হৃদয়হীন কাঠ তথ্যের সমাহার, নিপাট তত্ত্বের সংকলন; তাকেও আমি মূল্যবান জ্ঞান করি, তারও বিপুল প্রয়োজনীয়তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু সাহিত্য বা শিল্প-বিচারে আজ আমি তথ্য ও তত্ত্বের সঙ্গে হৃদয়, বোধ ও প্রজ্ঞাকে চালিয়ে দিতে উৎসুক, যুক্তির শক্ত গিঁটের ভেতরে সঞ্চার করতে চাই অনুভূতি। অনেকে বলেন : আমার গদ্য-ভাষা ক্রমশ সরল হয়েছে; তাঁরা হয়তো লক্ষ করেন না, আমার গদ্যে মেধা ঝরিয়ে ক্রমব্যাপ্ত হয়েছে হৃদয় এবং কোমলতার কেন্দ্রীয় কারণ হয়তো সে-ই।

কেন অবিরলভাবে গদ্য লেখা? কেন দিবারাত্রি কঠিন পাথর ভেঙে যাওয়া? একটি কবিতায় ('কেন লিখি', 'নির্বাচিত কবিতা') একবার লিখেছিলাম, বিশ্বপ্রকৃতিতে বিরামহীন বিস্ময়ের উদ্বোধনই তার কারণ। একথা, এখন মনে হচ্ছে, আমার কবিতার জন্য সত্য মৌহূর্তিক প্রবন্ধের জন্যও হয়তো সত্য। কিন্তু দীর্ঘ, যত্নশীল, পরিশ্রমসাধ্য গদ্যরচনাগুলির কারণ বোধ হয় সম্পূর্ণ বিপরীত। হ্যাঁ, শাদা শূন্য একাকী নিঃসঙ্গ ঘণ্টাগুলি ভরাতেই আমি ব্যাপক গদ্য লিখেছি। চাকরিসূত্রে, বিবাহসূত্রে, পারিবারিক সূত্রে, সামাজিক অসংখ্য বন্ধনের সূত্রে, সাহিত্যিক খ্যাতি ও অখ্যাতির সূত্রে একটি বিরাট উদ্ব্যস্ত জটিলতার মধ্যে প্রবেশ করেও আমি প্রতি মুহূর্তে একাকিত্বের দুঃসহ চাপ বোধ করেছি। তাই আমার গদ্য লিখে যাওয়া, এই কঠিন পাথর উদয়াস্ত ভেঙে চলা। মিকেলেঞ্জেলো তাঁর নারী-পুরুষের একটি শিল্পকর্মে পুরুষকে নাম দিয়েছিলেন দিবস, নারীকে রাত্রি। আমার ক্ষেত্রে গদ্য দিবস-পুরুষ, কবিতা নারী-রাত্রি। এই দুই মিলে আমি আমার দিনরাত্রি রচনা করেছি। এক্ষেত্রেও আমার স্বভাবের ও সাহিত্যের অন্তর্গত কূটাভাসিক সত্যই সম্ভবত সম্প্রকাশিত হয়।

একদিন দুপুরবেলা সমুদ্রতীরে একাকী দাঁড়িয়ে নিজেকে এমন নিঃসঙ্গ একাকী অসহায় মনে হয়েছিল যে আমি ছুটে পালিয়ে এসেছিলাম আমার হোটেলের কক্ষে। বিশাল জীবনের সামনেও আমার তেমনি নিজেকে নিঃসঙ্গ একাকী অসহায় মনে হয়। ছুটে পালিয়ে আসি যে আশ্রয়ে, সে-ই আমার গদ্য।

২

একুশ বছর বয়সে প্রকাশিত হয় আমার প্রথম প্রবন্ধ 'কথাসাহিত্য প্রাসঙ্গিক'। ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত এই প্রবন্ধটি লিখেছিলাম তার আগের বছর, অর্থাৎ আমার কুড়ি বছর বয়সে। লেখাটি বেরিয়েছিল আমারই বন্ধুবান্ধবের উদ্যোগে প্রকাশিত 'সাম্প্রতিক' পত্রিকায়। তথ্যটি এজন্য উল্লেখ করছি যে, আজ মনে হয়, আমার ওই আত্মভাষায় প্রকাশের জন্য প্রয়োজন ছিল নিজস্ব পত্রিকার। ওই সংখ্যাতেই 'আত্মতাড়িতেরা' নামে একটি গল্পও প্রকাশিত হয়েছিল আমার— ওই গল্পটিও ওই প্রবন্ধের ভাষায়

লেখা। এক গদ্যভাষায় দুই ভিন্ন মাধ্যমিক রচনার জন্য এই দুটি লেখা পাশাপাশি পাঠযোগ্য।

এই প্রবন্ধের সমকালীন বা পূর্বকালীন প্রায় সব গদ্য-রচনাই লুপ্ত হয়েছে আমার। তবু এই গদ্যরীতির ধরনটিই আমার প্রধান পরিচায়ক হিশাবে দাঁড়িয়ে যায়। আমি নিজেও সোৎসাহে লেগে যাই তার পশ্চাদ্ধাবনে। প্রথম থেকেই আমি ভাষাকে বিষয়ের সমানই গুরুত্ব দিয়েছিলাম। (মনে আছে, আমার প্রথম গদ্য-রচনা প্রকাশের আগে বাংলা ভাষার বিখ্যাত-অখ্যাত বিভিন্ন লেখকের গদ্য লেখা সামনে রেখে আমি গদ্য-রচনার অনুশীলন করতাম। তারপর, একটু বড় হয়েই দীর্ঘ অনুশীলনের পর আমার প্রথম গদ্য-রচনা প্রকাশিত হয়।) আসলে আত্মা ও আঙ্গিক আমার কাছে তুল্যমূল্য। কী বলছি, তার মতোই তাৎপর্যপূর্ণ কীভাবে বলছি। (কিন্তু আমাদের দেশে যেহেতু আলোচনা সমালোচনা মাত্রই একান্তভাবে বিষয়নির্ভর; কাজেই আমাকে দীর্ঘকাল অনেক সমালোচনার সম্মুখীন হতে হয়েছে এবং এখনো হয়। বিষয়নির্ভর দৃষ্টিকোণের জন্য অনেকের চোখ ধাঁধিয়ে গেছে আমার গদ্যভাষায়; আমি সত্যিই কিছু নতুন কিছু বলতে চেয়েছি কি না, তা তারা খতিয়ে দ্যাখেননি অনেক সময়।) আমার প্রথম প্রবন্ধেও আমি কিছু বলতে চেয়েছিলাম। তা আর কিছু নয়— তা আমার নিজের এবং আমার কালের লেখকদের গল্প-উপন্যাসের আদর্শ কী হবে সে বিষয়ে একটি ব্যক্তিগত দিকনির্দেশ বা প্রস্তাব।

অনেক দিন পর্যন্ত আমার অভ্যাস ছিল (হয়তো এখনো আছে) আমার সৃষ্টিশীল লেখার সমান্তরালে আমার প্রবন্ধকলাকে স্থাপন করা। তাই অনেক সময়ই আমি আমার সৃষ্টিশীল লেখার সঙ্গেই প্রস্তাবমূলক প্রবন্ধ লিখেছি। যেমন, আমার গল্প-উপন্যাস বিষয়ে 'কথাসাহিত্য প্রাসঙ্গিক' প্রবন্ধটি, তেমনি কবিতা বিষয়ে 'শব্দের পাপ ও অন্যান্য অনুষঙ্গ', নাটক বিষয়ে 'বন্ধ দরোজায় ধাক্কা' ইত্যাদি। আর একটি প্রস্তাবধর্মী প্রবন্ধ লিখেছিলাম 'আধুনিক সাহিত্যের মূলসূত্র' নামে, যাতে আসলে আমি সংহত করে এনেছিলাম আমার আধুনিক সাহিত্য প্রাসঙ্গিক সার্বিক ধারণাসমুচয়। এই প্রবন্ধগুলি আমার সৃষ্টিশীল রচনার চাবি হিশাবে ব্যবহার করা যেতে পারে।

প্রকাশের প্রথম বছরগুলিতে এরকম কিছু প্রবন্ধ লেখার পর আমি লিপ্ত হয়ে পড়ি মুখ্যত সমালোচনায়। (ষাটের দশকের প্রথম দিকে আমার

একটি ঝোঁক ছিল ব্যক্তিগত প্রবন্ধ লিখবার। উত্তরকালে প্রবন্ধের এই আত্মসমাচ্ছন্ন শাখাটি আর আমাকে আকর্ষণ করেনি।) সমালোচনা লিখতে গিয়ে আমি প্রায় প্রবন্ধ ব্যাপারটিই বিস্মৃত হয়েছিলাম। অনেক বছর পর 'কবিতা' ও 'আমার বিশ্বাস' নামে দুটি প্রবন্ধে আমার দৃষ্টি, অনুভূতি, উপলব্ধি, অভিজ্ঞতা, অধ্যয়ন রূপ পায়। এখন, আবার চিন্তা করছি, কিছু প্রকৃত প্রবন্ধ রচনা করবার।

৩

সমালোচনাত্মক লেখায় আমি মনোনিবেশ করি আমার ষোলো-সতেরো বছর বয়স থেকে। আমার প্রথম প্রেম ছিলেন সুধীন্দ্রনাথ দত্ত। আজ ভাবতে ভালো লাগে কবির জীবদ্দশাতেই একজন কিশোর মুগ্ধ ও মগ্ন হয়েছিল তার কবিতায়। সুধীন্দ্রনাথ বিষয়ে লেখাটি যখন সম্পূর্ণ করি, ততদিনে তিনি মৃত হয়েছেন।

এরপর থেকে আমি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন লেখক-কবির প্রেমে পড়েছি। আমার সমালোচনার প্রথম বীজ আমার ভালোবাসা; দ্বিতীয় বীজ আমার ক্রোধ। যে লেখকের প্রেমে পড়িনি তার আলোচনায় আমি লিপ্ত হতে পারিনি কখনো। খণ্ডিতভাবে আংশিকভাবে মৌহূর্তিকভাবে অনেকের দ্বারাই বিমুগ্ধ হয়েছি। তখন-তখনই লিখেছি। কোনো-একটি স্ফুলিঙ্গ উড়ে এসে পড়তেই আমি দাউদাউ করে জ্বলে উঠেছি। আবার কারো কারো দ্বারা বছরের পর বছর শুধু আবিষ্টই থেকেছি, ভেতরে ক্রমাগত জমতে দিয়েছি ভাবনা, অভিঘাত ও সংবেদনগুলিকে, দীর্ঘদিন পরে কলম ধরেছি। তবে, বলা বাহুল্য, সবসময় সকলের বিষয়ে লেখা হয়নি; অনেক প্রেম অস্পৃষ্টভাবে অতিবাহিত হয়ে গেছে। দু-এক সময় কোনো প্রকৃত লেখক অবহেলিত, অনালোচিত বা ভুলভাবে আলোচিত দেখে ক্রুদ্ধ হয়েও তাঁর আলোচনায় অগ্রসর হয়েছি। সবমিলিয়ে আমার কবিতার মতো আমার সমালোচনাও আবেগের শস্য— যতই কেন না আমি তাদের যুক্তির পরম্পরাক্রমে সাজাবার চেষ্টা করি। আসলে আমার শক্তির কেন্দ্রীয় উৎস আমার আবেগ যা জলোচ্ছ্বাসের মতো আমাকেই ভাসিয়ে নিয়ে গেছে অনেক সময়। কেউ-কেউ বলে থাকেন, লেখার ব্যাপারে আমি নাকি বিধিবদ্ধ, সময় নিয়ম ইত্যাদি অনুসরণ করি। তা ঠিক নয়। আমি

বিধিবদ্ধতাকে ঘৃণা করি, নিয়মাবলি শিল্পীর জন্য আমি মনে করি বিঘ্নস্বরূপ, যান্ত্রিক তো বটেই, শেষ পর্যন্ত তা বন্ধ্যত্বও ঘটাতে পারে। সেজন্য আমি মাঝে-মাঝে নিজের বিরুদ্ধেও যেতে ভালোবাসি। আমি অনিয়মী ও স্বেচ্ছাচারী হয়ে আমার কেন্দ্রীয় উৎসকে বাঁচিয়ে রেখেছি।

দীর্ঘ, সযত্ন, নিরন্তর মনোযোগ যাদের বিষয়ে উৎসাহিত থেকেছি, মোটামুটি ধারাক্রম অনুযায়ী তাঁরা হলেন : সুধীন্দ্রনাথ দত্ত, নজরুল ইসলাম, ফেদেরিকো গারথিরা লোরকা, জীবনানন্দ দাশ, সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্, ফররুখ আহমদ, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, শাহাদাৎ হোসেন প্রমুখ। এদের কারো কারো বিষয়ে গ্রন্থ রচনা বা সম্পাদনা করেছি। কোনো লেখাই, আমার বিবেচনায়, এখন পর্যন্ত সম্পূর্ণ হয়নি।

সুধীন্দ্রনাথ দত্ত বিষয়ে দীর্ঘ প্রবন্ধটি ('সুবীন্দ্রনাথ দত্ত : কালো সূর্যের নিচে বহ্ন্যুৎসব', 'নির্বাচিত প্রবন্ধ' ও 'দশ দিগন্তের দ্রষ্টা') আমার প্রথম সমালোচনামূলক রচনা। এই দীর্ঘ সমালোচনা-প্রবন্ধটির জন্য আমার দীর্ঘ প্রস্তুতি ও উদ্যোগ ছিল। লেখাটি সম্পূর্ণ করার পর সুধীন্দ্রনাথ বিষয়ে আমার আতীব্র উৎসাহ নির্বাপিত হয়। উত্তরকালে সুধীন্দ্রনাথ বিষয়ে বিচ্ছিন্নভাবে আরো দু-একটি সমালোচনা লিখলেও ওরকমভাবে অধিকৃত হইনি আর। সুধীন্দ্রনাথের কাছে শিখেছি দুরূহের মর্ম ভেদ করার আনন্দ এবং যুক্তিবিন্যাস। আমার স্বভাবের বিপরীত (কোনো-কোনো দিক থেকে সধর্মীও বটে) ধরনের লেখার সংস্পর্শ আমাকে সমৃদ্ধ করেছে। আবেগ ও কল্পনামত্ত তরুণ লেখককে সুধীন্দ্রনাথ শিখিয়েছেন কী করে আবেগকে চালাতে হয় পাড়-বাঁধা উচ্ছলতায় আর কল্পনার গোলাপে মেশাতে হয় চিন্তার ইস্পাত।

'নজরুল-রচনাবলী' হাতে পেয়ে ও পড়ে নজরুল বিষয়ে লিখতে শুরু করি। নজরুল-সম্পৃক্ত আমার প্রায় সমস্ত লেখা আমার 'নজরুল ইসলাম/কবি ও কবিতা' গ্রন্থে সাশ্রিত। নজরুলের কবিতা-গান পড়েছিলাম একটি নিভৃত কোলাহলহীন স্থানে। এবং ফলত একটি মগ্নতার মধ্যে। নজরুলের মধ্য দিয়ে আমি আমার সমালোচনারীতি আবিষ্কার ও নির্মাণ করি। তা হচ্ছে নিবিড় পাঠের মধ্য দিয়ে শরীর থেকে বিষয়ের আত্মার দিকে যাওয়া। হয়তো আমার সমালোচনায় এই শারীরপন্থি রীতি অনুসৃত হয়েছে। আমাদের বিষয় প্রধান সমালোচনার ধারায় আমি এই রীতি প্রবর্তন করেছি। (মজা করে বলা যেতে পারে : আমার গল্প উপন্যাসেও

অনেকের বিবেচনায় শরীর এক প্রধান ব্যাপার, আমার সমালোচনাতেও তাই।)

জীবনানন্দ দাশ বিষয়ে লিখতে শুরু করি ১৯৭১ সালের পয়লা জানুয়ারি থেকে, একেবারে দিন-ক্ষণ ঠিক করে, আমাদের ভাষার প্রধান একজন কবিকে আমি জেনে নিতে চেয়েছিলাম। নজরুলের কবিতা প্রথমবারের মতো ব্যাপকভাবে পাঠ করে আমার মনে হয়েছিল নজরুল যে মূলত চিত্রকল্পেরই সম্রাট, বিষয়বাদী সমালোচকেরা তা খেয়াল করেননি। জীবনানন্দ দাশকেও আমি আলোচনা শুরু করেছিলাম খুব অনুপুঙ্খ ধরে, গভীর নিমগ্নতায়। জীবনানন্দ বিষয়ে এখন পর্যন্ত আমার দুটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে—'শুদ্ধতম কবি' এবং 'জীবনানন্দ দাশের কবিতা'। ক্রমশ জীবনানন্দ ও নজরুলের সাহিত্য ব্যাপারে আমি নিয়োজিত হই সার্বিক আগ্রহেই (একমাত্র তাদের জীবন বিষয়ে আমি প্রায় নিঃশব্দ থেকেছি)। জীবনানন্দ ও নজরুলের লুপ্ত ও লীয়মান লেখা সম্পর্কেও ক্রমশ আমি আগ্রহী হয়ে উঠি। নজরুল ও জীবনানন্দ বিষয়ে আমার উৎসাহ আজও অপরিমেয়।

কবিতা বিষয়েই দীর্ঘ বিশ্লেষণাত্মক আলোচনা লিখেছি, কথাসাহিত্য নিয়ে নয়— এই বিবেচনা থেকে শুরু করেছিলাম সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্ ও মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়ে লিখতে। সাধারণভাবে নিয়ম হচ্ছে গল্প-উপন্যাসের আলোচনা অনেকখানি প্রত্যক্ষে বা পরোক্ষে কাহিনিনির্ভর। সেক্ষেত্রে আমি বিশ্লেষণাত্মক পদ্ধতি প্রয়োগ করতে চেষ্টা করেছি। এই লেখাগুলি এখনো একসঙ্গে গ্রন্থধৃত হয়নি।

আনন্দ পেয়েছি ফররুখ আহমদ এবং শাহাদাৎ হোসেনের কবিতা সংকলন ও সম্পাদনা করে। ফররুখ আহমদের মতো মৌলিক কবি যেকোনো ভাষার সম্পদ। আর শাহাদাৎ হোসেনের মতো প্রকৃত কবির বিস্মরণ আমাদের সর্বাত্মক দীনতারই চিহ্নবহ।

বলেছি, এক-একজন লেখক বিষয়ে আমি উৎসাহিত হয়েছি ভালোবাসা থেকে, বেদনা থেকে, এমনকি ক্রোধ থেকেও। স্বাভাবিকভাবে বাংলা সাহিত্যের আধুনিক পর্বটাই আমাকে বেশিভাবে উদ্বোধিত করেছে। তিরিশের শ্রেষ্ঠ কবি জীবনানন্দ দাশকে নিয়ে আমি যেমন আলোচনা করেছি, তেমনি আমার বিবেচনায় আমি এনেছি তিরিশের শ্রেষ্ঠ কথক (আমার মতে) মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়কে। 'শিল্প বিশাল, আয়ু অতিশয় হ্রস্ব'

(অনুবাদ : বুদ্ধদেব বসু): আধুনিক কবিতার জনকের এই বাণী আমি মনে রাখি। ফলে, ইচ্ছা থাকলেও সবার ওপরে আলোচনা করা সম্ভব হয় না। আমাকে নির্বাচন করে নিতে হয় শ্রেষ্ঠ লেখককে। আবার বাংলা সাহিত্যকে আমি বিভক্ত করিনি; কিন্তু আমি যে ধর্ম সমাজের সন্তান তার কথাও বিস্মৃত হইনি। তাই আমি জীবনানন্দের পাশেই আলোচনা করেছি ফররুখ আহমদের, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশেই সৈয়দ ওয়ালীউল্লাহ্‌র। বিদেশি লেখকরাও আমার অনেক আলোচনার কেন্দ্র ও পরিধি নির্মাণ করেছেন। ছাত্রাবস্থায় আমার উচিত ছিল যে তিনজন নিয়ে বিস্তর পড়াশোনা করেছিলাম, সেই ডিলান টমাস, ডি. এইচ. লরেন্স ও জেমস জয়েস-কে নিয়ে সমালোচনা করা। সেসব করা হয়নি। উত্তরকালে যে লেখককে নিয়ে আমি সবচেয়ে মগ্ন অথচ আলোড়িত থেকেছি তিনি হিস্পানি কবি ফেদেরিকো গারথিয়া লোরকা। অনুবাদ করেছি লোরকা-র কবিতা ও নাটক; তার সম্বন্ধে আলোচনা করেছি।

কোনো-কোনো কবি বা লেখকের মতো কোনো-কোনো বিষয়ও আমাকে লুব্ধ-মুগ্ধ করেছে। যেমন: বিদেশি সুররিয়ালিজম বা বাংলা ছন্দ। সুররিয়ালিজম নিয়ে লিখতে-লিখতে আকৃষ্ট হয়েছি চিত্রকলার প্রতি। আর বাংলা ছন্দ নিয়ে লিখতে গিয়ে আবিষ্কার করেছি পত্রের ধাঁচ ব্যবহার করলে আলোচনা সজীব ও তপ্ত, অন্তরঙ্গ ও সুরেলা হয়ে ওঠে।

১৯৭৬ সালে প্রকাশিত আমার 'নির্বাচিত প্রবন্ধ' গ্রন্থে আমার তখন পর্যন্ত মোটামুটি নানা ধরনের আগ্রহের একটি গদ্য পরিচয় একত্রবদ্ধ আছে।

এছাড়া লিখেছি আমার সমকালীন (বড় অর্থে : আমার সমকালে জীবিত সকল লেখক) লেখকদের বইয়ের অনেক রিভিয়্যু। তাৎক্ষণিকের মধ্য দিয়ে স্পর্শ করতে চেয়েছি সমকালকে। আমার নিজের ক্ষেত্রে লক্ষ করেছি, অগ্রজদের অনেকে যেমন সানন্দে স্বীকার করে নিয়েছেন তেমনি অনেকে বুঝে উঠতে পারেননি। লক্ষ করেছি, অনেকেই পরবর্তী সাহিত্য-কর্মীদের সম্বন্ধে সন্দিহান। আমি নই। কেননা, আমি জানি, আমি নিজে যেমন সাহিত্যকে গভীরতম শ্রদ্ধা, ভালোবাসা ও বিনতিতে গ্রহণ করেছিলাম, কিন্তু অনেকের কাছে তা মনে হয়েছিল 'দুদিনের ক্রীড়া', পরবর্তীদের কেউ-কেউ আমারই মতো সাহিত্যকে জীবনের সঙ্গে এক পাল্লায় চড়িয়ে দেবেন। জেনারেশন গ্যাপ ঘটেই যায়। সহানুভূতি,

ভালোবাসা ও সযত্ন অনুশীলনের মধ্য দিয়েই বুঝে ওঠা যায় পরবর্তীদের। আমার পরবর্তীদের সাহিত্য কাজ বুঝে ওঠার জন্য আমি সেভাবেই অগ্রসর হয়েছি। আমি যে সর্বত্র রিভিয়্যু লিখে ন্যায়বিচার করতে পেরেছি, তা নয়। কিন্তু যথাসাধ্য সত্য বিচার করতে সচেষ্ট থেকেছি। রিভিয়্যু লিখে অনেক সময় অনেকের সঙ্গে সম্পর্ক তিক্ত হয়েছে। ফলে গ্রন্থালোচনায় বিরতি পড়েছে মাঝে-মাঝে। কিন্তু আবার একদিন সব ভুলে, গ্রন্থ সমালোচনা করতে বসেছি। সমকালীন, তাৎক্ষণিক আলোচনা নিশ্চয় কঠিন, হাস্যকর বিভ্রান্তির আশঙ্কাও থেকে যায়; কিন্তু, আমি মনে করি, কেবল প্রতিষ্ঠিত শিল্পের বিচারে উত্তীর্ণ, অগ্রজ লেখকদের বিবেচনা-পুনর্বিবেচনাই সমালোচনার শেষ কৃত্য নয়; বিপজ্জনক সমকালীন লেখকদের সমালোচনাও একটি অবশ্যকাজ। ভুল হতে পারে, তিক্ততা সৃষ্টি হতে পারে, কিন্তু দু-একটি বিজয়ী মুহূর্ত যা সম্পাদিত হয় তার মূল্য অনেক : কেননা সমালোচনার কাজ কেবল যা আছে তার বিশ্লেষণ নয়, যা সংগুপ্ত আছে তার উদ্ভাসনও তার কাজ, যা নেই তার দিকে দৃষ্টিপাতও তার কাজ। তাই সমালোচনা কেবল সৃষ্টিশীলতার প্রাণহীন বিশ্লেষক নয়, কখনো-কখনো সে দিগন্তদিশারির ভূমিকাও উদ্‌যাপন করে।

৪

অল্পবয়সেই আমি লক্ষ করেছিলাম যে বাঙালি-মুসলমান লেখকদের মধ্যে একদল সৃষ্টিশীল, আর-একদল মননজীবী; একদিকে মীর মশাররফ হোসেন, নজরুল ইসলামগণ; আর-একদিকে কাজী আবদুল ওদুদ, কাজী মোতাহার হোসেনরা। এর ফলে বাঙালি মুসলমান রচিত সাহিত্যে সৃষ্টিস্থিতিরা অখণ্ডতা ব্যাহত হয়েছে। সেজন্যই আমার গল্প-কবিতার পাশাপাশি আমি প্রথম থেকেই প্রবন্ধ ও সমালোচনা লিখে আসছি। কেবল হৃদয় নিয়েই আমি কখনো তৃপ্ত থাকিনি; আমি তার ভেতরেই স্থাপন করতে চেয়েছি মননের কঠিন শিরদাঁড়া।

ছেলেবেলা থেকেই আমি অসম্ভব কল্পনাপ্রবণ; আমার কল্পনা ঈশ্বর বা প্রকৃতির দান, তার জন্য কোনো চেষ্টা করতে হয়নি আমার। কিন্তু বুদ্ধি, মনন, চিন্তাচর্চা এসব আমার নিজস্ব উপার্জন। আমি কেবল ঈশ্বর-প্রদত্ত সম্পদে খুশি ছিলাম না; আমি নিজেও কিছু রোজগার করতে চেয়েছিলাম।